ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

সার-সংক্ষেপ

০৪ আগস্ট ২০২৫

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো*
মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*
ফারহানা রহমান, *রিসার্চ ফেলো*
মো. মোস্তফা কামাল, *রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ*
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, *রিসার্চ এসোসিয়েট*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহকারী
ইসরাত রুবাবা তাহসীন, *রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট*
আসিফ করিম চৌধুরী, *রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়তার জন্য ইসরাত রুবাবা তাহসীন ও আসিফ করিম চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই গবেষণার মান উন্নত করার জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য দেওয়া, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। গবেষণার ধারণাপত্র তৈরিতে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গবেষণাটি পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান এবং খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সবশেষে গবেষণার ধারণাপত্র তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার সময় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, মতামত ও তথ্য প্রদানের জন্য নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশ: ৪ আগস্ট ২০২৫ (পরিমার্জিত সংস্করণ ১৪ আগস্ট ২০২৫)

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে নারী ও শ্রমজীবি মানুষের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়, এবং ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এ অভীষ্ট অর্জন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে; তবে চলার পথে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি রয়েছে।

দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ধারাবাহিকভাবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিশেষ করে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বহুমুখী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রেক্ষিতে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি ও রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৪ একগুচ্ছ সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়, এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় অব্যাহত রয়েছে।

রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'নতুন বাংলাদেশ': কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী ১০০ দিনের ওপর পর্যবেক্ষণ" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর। এর ধারাবাহিকতায় 'কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী এক বছর: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে যেখানে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পরবর্তী এক বছরের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, বিশেষ করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে সরকারের নিয়মিত কার্যক্রম (আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক); অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ এবং বিভিন্ন অংশীজনের (রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনী) ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের ফলে রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ অভীষ্ট অর্জন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এক বছরে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা বাস্তবায়নে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তবে সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা একটি সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশিত অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচায়ক।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, সংস্কার কমিশনগুলোর আশু করণীয় সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো অগ্রগতির তথ্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পতিত - কোনো কোনো সুপারিশ 'বেছে নেওয়া'র প্রবণতা (পিক এন্ড চুজ) দৃশ্যমান। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচনে সুস্পষ্ট ও সুপরিকল্পিত কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করার ফলে বিভিন্ন সময়ে সরকারের ওপর বিভিন্ন অংশীজনের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা, প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায় - কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা যার অন্যতম প্রতিফলন। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও একইসাথে একদলের স্থলে অপর দলের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পুলিশ-প্রশাসনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা লক্ষ করা যায়, এসকল ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান ছিল। সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ ভেতর থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ফলে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশিত পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়নি।

নিজস্ব এজেন্ডাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত থাকা বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যা গণ-অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে সুস্পষ্ট বিভাজন

পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি - দলবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ ও রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তথ্য প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার, এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়। এক বছরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।

সবশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র সংস্কারের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহে বেশিরভাগ বিষয়ে বড় দল ও সহযোগীদের ভিন্নমত "নোট অব ডিসেন্ট"-সাপেক্ষে জুলাই সনদে ঐকমত্য বিবেচিত হওয়ায় কর্তৃত্ববাদী চর্চা বাস্তবে প্রতিহত করা সম্ভব হবে, এমন প্রত্যাশার পথ দুরূহ। অন্যদিকে, ঐকমত্য অর্জিত সংস্কার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা ও সুনির্দিষ্ট পথরেখা কিভাবে নিশ্চিত হবে এই অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি করেছেন সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, মো. জুলকারনাইন, ফারহানা রহমান, মো. মোস্তফা কামাল ও মোহাইমেনুল ইসলাম। গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছেন ইসরাত রুবাবা তাহসীন ও আসিফ করিম চৌধুরী। গবেষণাটি পরিচালনার বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে রাষ্ট্র সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার ও অন্যান্য অংশীজন উপকৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সার-সংক্ষেপ

প্রেক্ষাপট

গণ-আন্দোলনের ফলে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব অর্জন। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন সহিংসতা, রক্তপাত ও ত্যাগের বিনিময়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে, এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ৮ আগস্ট ড. মুহম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৩ জন; এছাড়া তিনজন বিশেষ সহকারী (উপদেষ্টার পদমর্যাদা), এবং সাতজন বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) রয়েছেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা ছিল একটি বৈষম্যহীন, সম-অধিকারভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো এবং নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্ত নিশ্চিত করা, যার মূল অভীষ্ট জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় আমূল পরিবর্তন যেখানে জবাবদিহিমূলক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে যা আন্দোলন বা বর্তমান সংস্কার প্রক্রিয়ার অন্যতম আকাঙ্ক্ষা।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় - সেগুলি হলো দুর্বল অর্থনীতি, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ, সব খাত ও প্রতিষ্ঠানে পতিত সরকারের সমর্থক ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অসহযোগিতা, দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, দুর্নীতিগ্রস্ত সেবা ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অরাজকতা, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার, খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংস্কার, নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তবে সময়ের ধারাবাহিকতা ও উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য দাঁড়ায় তিনটি - বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার; এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রধান লক্ষ্য গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করা। এ সংক্রান্ত গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি টিআইবি পর্যবেক্ষণ করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে টিআইবি'র পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট ২০২৪ একগুচ্ছ সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়, এবং পরবর্তীতে খাতভিত্তিক পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন ও প্রকাশ, বিভিন্ন খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা, বিভিন্ন টাস্কফোর্স ও কমিটির নিকট সুপারিশ উপস্থাপন, এবং উপদেষ্টাসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ে মতবিনিময় অব্যাহত রয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারসহ সকল অংশীজনের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর প্রথম ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ (১৮ নভেম্বর ২০২৪) করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহের ওপর পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সংস্কার এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারের অগ্রগতির পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণাপদ্ধতি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর এক বছরের ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, সরকারি কার্যক্রম, দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
২. বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; এবং
৩. অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সীমাদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে চিহ্নিত করা।

এ গবেষণায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হচ্ছে-বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও তার পূর্বে সংঘটিত অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার; রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কাঠামো সংস্কার; বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান সংস্কার; সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম; রাষ্ট্রীয়/সরকারি বিভিন্ন খাতে নিয়মিত কার্যক্রম (আইন-শৃঙ্খলা, আর্থিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক); অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচার রোধ; এবং রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, সামরিক বাহিনীর ভূমিকা।

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রধানত গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ন্যায়বিচার, সংস্কার, ও নির্বাচন এবং অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা ও সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া / চূড়ান্ত); সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার; সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট হতে উৎস সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় ০৫ আগস্ট ২০২৪ - ১৪ আগস্ট ২০২৫ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সময়কাল ছিল এক বছর (০৫ আগস্ট ২০২৪ - ০৪ আগস্ট ২০২৫)।

গবেষণার ফলাফল

১. বিচার

ক. জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ

অগ্রগতি: ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় (১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) সারা দেশে দায়ের করা ৭৫২টি হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতের ঘটনায় ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী, হত্যার ইন্ধনদাতা ও নির্দেশদাতাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দেখা যায় ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ১ হাজার ৭৩০টি, যেখানে হত্যা মামলা ৭৩১টি। ৩০ জুন পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলার ৭০ শতাংশ মামলার তদন্তে 'সন্তোষজনক অগ্রগতি' হয়েছে, যেখানে ৬০ - ৭০টি হত্যা মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে। বেশির ভাগ মামলায় শেখ হাসিনা ছাড়াও সাবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতা, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকদের আসামি করা হয়েছে। ২২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত পতিত সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ১১২ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন।

গণ-অভ্যুত্থানে হত্যায় জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়েছে। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় সরকার পতন-পরবর্তী ১১ মাসে সারা দেশে পুলিশের বিরুদ্ধে ৭৬১টি মামলায় আসামি হয়েছে ১ হাজার ১৬৮ জন পুলিশ, এর মধ্যে ৬১ জনকে গ্রেপ্তার (৮ জুলাই ২০২৫) করা হয়েছে। কিছু কিছু বিভাগীয় পদক্ষেপের বাইরে বাস্তবে পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর জবাবদিহির অগ্রগতি হয়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে করা এখনো কোনো মামলার তদন্ত শেষ না হওয়ার পেছনে পুলিশের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে না পারা সরকারের সদিচ্ছা ও সক্ষমতার ঘাটতির পরিচায়ক।

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন তিন বার সংশোধন হয়েছে। আইন সংশোধনের পাশপাশি তিন সদস্যের আরেকটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ-অভিযুক্তের সংখ্যা, কাজের চাপ ইত্যাদি বিবেচনায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে পূর্বে গঠিত তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জুলাই-আগস্ট গণহত্যায় জড়িতদের বিচারপ্রক্রিয়া চলমান। গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের দেড় দশকের শাসনামলে গুম-খুন-নির্যাতনের ঘটনায় ৪ আগস্ট পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে অভিযোগ এসেছে ৪৫০টি ও মামলা হয়েছে ৩০টি। এসব মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২০৯ জন আসামি যার মধ্যে ৮৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের পূর্বে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়। সম্প্রতি ১০ জুলাই ২০২৫, গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠিত এবং বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই মামলায় বাকি দুই আসামি হল সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, বর্তমানে ভারতে পলাতক ও অন্য আসামি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। তবে ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজে ধীরগতি নিয়ে শহীদ পরিবারের মাঝে অসন্তোষ রয়েছে।

ঘাটতি: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অভিযুক্ত গোপনে দেশত্যাগ করেছেন। দেশত্যাগে সেনাবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা সংস্থা ও স্থানীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সহায়তার অভিযোগ রয়েছে। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অন্তত ১৫ জন কেন্দ্রীয় নেতা, সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা দেশ ছেড়েছেন বলে জানা যায়, যদিও অবৈধ পথে দেশ ছাড়ায় ইমিগ্রেশন বিভাগের নথিতে তাঁদের দেশত্যাগের তথ্য নেই। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পরবর্তী সময়ে ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মামলায় ঢালাওভাবে আসামী হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত সরকার-সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলোয় জুন ২০২৫ পর্যন্ত অভিযুক্ত আসামি প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন ৪ হাজার ১৫০ জন। এছাড়া পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৯ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অন্তত ৩৫১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে হত্যা মামলা ২১৪টি। এসব মামলার ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে, যেখানে পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করা এবং চাঁদাবাজি ও হয়রানি করতে অনেককে আসামি করা হয়েছে, আবার অব্যাহতি দেওয়ার নামে চাঁদাবাজি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাদী জানেন না আসামী কে বা কারা। চাপের মুখে তদন্ত না করে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হলেও এবং কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও ঢালাও মামলা, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের ধরন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট মামলা না দেওয়ার

ফলে মামলার ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। এসকল মামলার প্রতিবেদন তৈরিতে চ্যালেঞ্জ সম্মুখীন হন তদন্ত কর্মকর্তারা। পদ্ধতিগত জটিলতা ও ঘটনার পরিষ্কার চিত্র না থাকায় ৩০ শতাংশ মামলার অগ্রগতি হয়নি। এছাড়া গত সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি পরিলক্ষিত হয়েছে - এককজনকে একাধিকবার একেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তারের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডের পুরনো ধারা বিদ্যমান বলে লক্ষ করা যায়। বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনার সময় কয়েকটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী আদালতে আক্রমণের শিকার হওয়া, পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনে লাঞ্ছিত হওয়া, সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ, এবং আসামী পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধন না করে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক/ সমালোচনা হয়েছে, এবং ট্রাইব্যুনালে নিয়োগকৃত বিচারকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা হয়। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হন। কিন্তু ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় যারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত গণ-অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো মামলা, গ্রেফতার বা হয়রানি না করার নির্দেশ দেওয়া হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায়। পরবর্তীতে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। একদিকে নির্বিচার দায়মুক্তি, আর অন্যদিকে ঢালাওভাবে প্রতিশোধপ্রবণ আটক ও জামিন না-মঞ্জুর বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

খ. গুম সংক্রান্ত তদন্ত ও বিচার

অগ্রগতি: আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুমের ঘটনা তদন্তে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ২৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখে কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনে (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রটেকশন অব অল পারসনস ফ্রম এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স (আইসিপিপিইডি) স্বাক্ষর করে ২৯ আগস্ট ২০২৪। গুম সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন এ পর্যন্ত দুইটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। কমিশনের কাছে ১ হাজার ৮৫০টি অভিযোগ দাখিল হয়, যার মধ্যে ১ হাজার ৩৫০টি অভিযোগ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে এ পর্যন্ত গুম হওয়া চারজনকে উদ্ধার করা হয়েছে; গুম হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে এখনো নিখোঁজ ৩৪৫ জন। গুমের শিকার হয়ে এখনো নিখোঁজ থাকা ব্যক্তিদের নামে তার পরিবারের কাছে 'নিখোঁজ সনদ' প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছে সরকার। এছাড়া ঢাকায় তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের কার্যালয় স্থাপনে সমঝোতা হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর)-এর তথ্যানুসন্ধান (ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং) প্রতিবেদন ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে র‍্যাব বিলুপ্তির সুপারিশ করা হলেও সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের অবস্থান অস্পষ্ট। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আয়নাঘরের অস্তিত্ব, গুম ও খুনের দায় স্বীকার করে ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন র‍্যাব মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান। বিভিন্ন সময়ে র‍্যাবের বিরুদ্ধে গুম খুনের যেসব অভিযোগ উঠেছে, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার বিচারের প্রত্যাশা জানিয়ে ভুক্তভোগীদের পরিবারের কাছে ক্ষমাও চান তিনি। অপরদিকে গুম ও খুনের দায়ের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা না থাকার দাবি করা হয়। তবে ৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে সামরিক কর্মসূচি নির্দেশকের কর্নেল মোঃ শফিকুল বলপ্রয়োগে গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা সংশ্লিষ্ট সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান। এখন পর্যন্ত তা তদন্তাধীন রয়েছে। গুমের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান অস্পষ্ট।

ঘাটতি: 'আয়না ঘর' থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করা হলেও নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আলামত নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। আলামত নষ্টের ক্ষেত্রে জবাবদিহির ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

২. সংস্কার: জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা

অগ্রগতি: দুই পর্যায়ে খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন কমিশন, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, নারীবিষয়ক, শ্রম ও স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংস্কার কমিশন। রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম দফায় গঠিত ছয়টি কমিশনের বাইরে অন্য কমিশনগুলো গঠন করার ক্ষেত্র নির্বাচনের যৌক্তিকতা পরিষ্কার নয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কমিশন গঠন করা হয়নি। সব সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন জমা পড়েছে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ হয়েছে। দেখা যায় ১১টি সংস্কার কমিশনের প্রধান সুপারিশের সংখ্যা ১,৭০০ এর বেশি। প্রথম ধাপের সংবিধান সংস্কার কমিশন ছাড়া বাকি পাঁচটি সংস্কার কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য মোট ১২১টি প্রস্তাব সরকারি ও সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য বাছাই করা হয়। সংস্কার

কমিশনের আশু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় দফায় গঠিত পাঁচটি কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোনো দিক-নির্দেশনা না থাকার কারণে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা, এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাবগুলির ওপর একটি জাতীয় অবস্থান তৈরি করা যা জুলাই সনদ তৈরির সাথে সম্পর্কিত। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। কমিশনের আওতায় দুই দফায় সংলাপ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২০ মার্চ থেকে ১৯ মে ২০২৫ প্রথম পর্বে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাদা আলোচনা হয়। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা হয় ৩ জুন থেকে ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত। প্রথম পর্বে ঐকমত্য হয়নি এমন ২০টি বিষয়কে মৌলিক কাঠামোগত সংস্কার প্রস্তাব হিসেবে চিহ্নিত করে সেসব বিষয়ে ৩০টি দলকে একসঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা হয়, এবং সবশেষে ২০টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

তবে জাতীয় ঐকমত্য তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কোন কোন প্রস্তাব আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, কিসের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দলকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তার মানদণ্ড পরিষ্কার করা হয়নি, কতগুলো দল কোনো বিষয়ে একমত হলে সেটা ঐকমত্য বলে বিবেচিত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো হলো - সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ পরিবর্তন; সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিত্ব; নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ; রাষ্ট্রপতির ক্ষমা-সম্পর্কিত বিধান; উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ; নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য চারটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন; স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন; প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদ; প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদে না থাকা; সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব; দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদে উচ্চকক্ষের গঠন; রাষ্ট্রপতির নির্বাচন; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব; তত্ত্বাবধায়ক সরকার; নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ; সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি; এবং রাষ্ট্রের মূলনীতি।

ঘাটতি: সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ছয়টি কমিশনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, নারীর সংখ্যা কম থাকা, সাবেক আমলাদের আধিক্য, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন) হয়েছে। সুপারিশ প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন, কমিশন বিলুপ্ত করার দাবি উঠেছে। এ বিষয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান। কোনো কোনো সংস্কার কমিশনের (স্বাস্থ্য, জনপ্রশাসন, পুলিশ, নারী) সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ ও দিকনির্দেশনার ঘাটতি দেখা যায়।

জাতীয় ঐকমত্যের জন্য পাঁচটি কমিশনের ১৬৬টি সুপারিশ নির্বাচন করা হয়। কমিশনগুলোর প্রতিবেদন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো অনৈক্য/বিরোধপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। আশু করণীয় যেসব বিষয় অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন কোনো আলোচনা হয়নি। এছাড়া সংলাপের আওতার বাইরে থাকা অনেক সুপারিশ ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দলের অনড় অবস্থান লক্ষ করা যায়। একই বিষয়ে বারবার আলোচনা করে দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ ছিল। আলোচনা প্রক্রিয়ায় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার অভিযোগ ছিল। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাবে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিয়ে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের মূল অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারী আসন নিয়ে যে ঐকমত্য হয়েছে তার ফলে নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্য কমিশন ও মানবাধিকার কমিশনের সংস্কারের ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর (ডিজিএফআই, ডিবি, এনএসআই, এনটিএমসি) সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

৩. আইনি সংস্কার

অগ্রগতি: অন্তর্বর্তী সরকার এ পর্যন্ত ৫০টি আইন প্রণয়ন করেছে। প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ; স্বেচ্ছায় অবসরের সময় কমানো; উপস্থিতি বিধি; আচরণ সংহিতা (কোড অব কনডাক্ট); সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন পরিবর্তন করা হয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩ সংশোধন করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধনী) অধ্যাদেশ; সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়া খাতভিত্তিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে কিছু আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে - বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট (সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫; 'বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা'; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫); আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট (ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫; রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫); স্থানীয় সরকার (বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগ); বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪); গণমাধ্যম (সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪)। তড়িঘড়ি করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আলাদা করার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ফলে রাজস্ব ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগের করায়ত্ত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি এবং অভূতপূর্ব সংকট উদ্ভূত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) আইন সংশোধনের মাধ্যমে বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

ঘাটতি: কোনো কোনো আইন (বিশেষকরে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৪) প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করলেও তাদের মতামতের প্রতিফলন হয়নি। কোনো কোনো আইন (সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫) প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু নাম পরিবর্তনের জন্য ১৩টি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) আইনের দুর্বলতা, বিশেষ করে সাংবিধানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব খর্ব করা হয়েছে। এছাড়া ফরেন ডোনেশন আইনের নির্বতনমূলক ১৪ নং ধারা রহিতের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি সরকার। আইন প্রণয়নে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্ভাব্য ফলাফল পর্যালোচনা ও স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া বিতর্ক বা প্রতিবাদের মুখে বারবার আইন সংশোধনের ফলে আইন/নীতি প্রণয়নকারী এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ওপর পরিপালনকারীদের অনাস্থা তৈরির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

ক. জনপ্রশাসন

অগ্রগতি: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তার পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দলীয়মুক্ত করার অংশ হিসেবে প্রশাসনিক রদবদল হয়েছে, যেমন পদোন্নতি, পদায়ন, বাধ্যতামূলক অবসর, চুক্তিতে নিয়োগ বাতিল ঘোষণা ও পরবর্তীতে আবার চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। ২২ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৫৪টি মন্ত্রণালয়ে ১ হাজার ৬১টি সংস্কার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরে দলীয় বিবেচনায় বঞ্চিত বিভিন্ন পর্যায়ের ১ হাজার ৫৪৯ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব, যুগ্ম সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে প্রায় ৫৫০ জনকে অনুমোদিত পদের বাইরে পদোন্নতি (সুপারনিউমারারি পদোন্নতি) এবং ৭৬৪ জনকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়া হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত চাকরির বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া মোট ৪০ জনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপারদের (এসপি) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত যুগ্ম সচিব ও সমপর্যায়ের পদে থাকা প্রশাসনের মোট ৪৫ জনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়েছে। মোট ৫১৬ জনকে (৪ এপ্রিল ২০২৫) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।

এ সময়ে কর্মকর্তাদের চাকরি-সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা; সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দেওয়া; যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া যে কোনো সরকারি তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা; বিদেশে সরকারি সফরে বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ সকল পরিবর্তন অনেকক্ষেত্রেই নামসর্বস্ব, প্রশাসনিক কাঠামোর প্রকৃত কোনো সংস্কার বা পরিবর্তন দেখা যায়নি। এছাড়া সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সব পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রণোদনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রথম থেকে নবম গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য ১০ শতাংশ এবং দশম থেকে বিশতম গ্রেডের জন্য ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি সরকারি কর্মচারীদের জন্য পে কমিশন গঠন করা হয়েছে।

ঘাটতি: বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে জনপ্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ও সিদ্ধান্তহীনতা চলমান রয়েছে। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে অতীতে দুর্নীতি-অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত থাকা, বিভাগীয় মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত, এবং আওয়ামী লীগের নানা অপকর্মের সহযোগী বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করা হচ্ছে। পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতা ও স্বচ্ছতার ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসনে জনপ্রশাসন ক্যাডারের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। গ্রেডভিত্তিক বৈষম্য, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য, পদোন্নতিতে বৈষম্য চলমান এবং প্রশাসন ক্যাডারের পদ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি দলের অনুসারীদের পরিবর্তে অন্য দল/ দলসমূহের প্রাধান্য/ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসরণ না করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। জনপ্রশাসনে অনিয়ম-দুর্নীতি ও দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা চলমান রয়েছে, যা সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিবন্ধক।

২২ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব থেকে শুরু করে প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ ২২টি মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভিত্তিক সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। চুক্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্তদের

প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, যার ফলে গত সরকারের আমলে বঞ্চিত, পদোন্নতিপ্রত্যাশী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। পিএসসি থেকে সুপারিশ পেয়েও বিগত সরকারের সময়ে চাকরি না পাওয়াদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, অন্যদিকে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও নিয়োগ না দেওয়া এবং বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত মোট ৩৬৯ জন উপপরিদর্শককে (এসআই) শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি বিতর্কিত হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো কর্মকর্তার বিতর্কিত কার্যক্রমের কারণে গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়। অন্তর্বর্তী সরকারের পুরো সময়জুড়ে সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ও বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন চলমান ছিল। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে ধীরগতি লক্ষ করা যায়। তবে একদিকে জনপ্রশাসনে পেশাদারিত্বের ঘাটতি, আর অন্যদিকে বিভিন্ন আন্দোলন মোকাবিলায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কৌশলগত অবস্থান ও ব্যবস্থা গ্রহণে দৃশ্যমান ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়।

খ. বিচার বিভাগ

অগ্রগতি: বিচার বিভাগকে দলীয়করণমুক্ত করার অংশ হিসেবে বিচার বিভাগে প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া এ সময়ে 'সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল' গঠন ও উচ্চ আদালতের রায়ে বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়। 'সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি-পদায়ন নীতিমালা, ২০২৪ (খসড়া) তৈরি করা হয় এবং ২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য পদায়ন বিধিমালা জারি করা হয়। পুরনো দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনসহ বেশকিছু আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মামলার নিষ্পত্তি বাড়াতে পৃথক আদালত স্থাপন ও পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ঘাটতি: আইন প্রণয়নের আগেই আইন কর্মকর্তা ও বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে দেখা যায়, এবং এসব নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি লক্ষ করা যায় - মামলা নিষ্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। পৃথক সচিবালয়ের খসড়া চূড়ান্ত হলেও এখন পর্যন্ত সচিবালয় গঠন হয়নি। বিচার বিভাগে প্রত্যাশিত সংস্কার হয়নি - রায় প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয়করণের প্রবণতা চলমান।

গ. জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন

অগ্রগতি: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের প্রথম ধাপের খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয় ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে। সব মিলিয়ে এখন গেজেটভুক্ত মোট শহীদ ৮৩৬ জন, আহত ১৩ হাজার ৭৯৮ জন। ২০২৫ সালের ১৭ জুন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনসহ অভ্যুত্থানের আদর্শ ও ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়। এর আওতায় নবগঠিত জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তরের কার্যক্রম নির্ধারিত হয়, এবং আহত-নিহতদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নকল্পে পূর্বগঠিত 'গণঅভ্যুত্থানসংক্রান্ত বিশেষ সেল' বিলুপ্ত হয়। অধ্যাদেশে গণঅভ্যুত্থানে শহীদ এবং আহত ব্যক্তিদের যথাক্রমে 'জুলাই শহীদ' এবং 'জুলাই যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। 'জুলাই শহীদ' পরিবারকে এককালীন ৩০ লাখ টাকা ও মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতা এবং আহত 'জুলাই যোদ্ধা'দের তিন শ্রেণিতে ভাগ করে আর্থিক, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সুবিধাবাবদ ১ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ২৩২.৬ কোটি টাকা এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪০৫.২ কোটি টাকা।

জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের অর্থ সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে। আন্দোলনে শহীদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থান, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসাসেবার জন্য ২০২৪ এর ১২ সেপ্টেম্বর 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠিত হয়। ফাউন্ডেশন থেকে এ বছরের জুলাই পর্যন্ত শহীদ পরিবার ও আহত মিলিয়ে মোট ৭ হাজার ৪৯৭ জনকে ১১১ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ৪ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত ৭৮ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে (থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে) প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বোপরি অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শহীদ পরিবার ও আহতদের এককালীন অর্থ প্রদান ও বিদেশে চিকিৎসাবাবদ মোট ২৫৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪ হাজার ২১২ টাকা ব্যয় করেছে।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতদের সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোটা সুবিধা চালু করা হলেও বিতর্কের সৃষ্টি হলে তা বাতিল করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত চাকরির ক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও চাকরিতে অগ্রাধিকার প্রদান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনার পরিপন্থী। এছাড়া ৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' (সাধারণ ছুটি) ও ১৬ জুলাইকে 'শহীদ আবু সাঈদ দিবস' ঘোষণা করা হয় ও পূর্বে ঘোষিত ৮ আগস্টের 'নতুন বাংলাদেশ দিবস' বাতিল করা হয়।

ঘাটতি: আন্দোলনে হতাহতের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে - এখন পর্যন্ত তালিকা চূড়ান্ত করা হয়নি, যা সরকারের ব্যর্থতার পরিচায়ক। সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যার তারতম্য লক্ষ করা যায়। মাসিক ভাতা চালু করার কথা

থাকলেও তা এখনো চালু হয়নি। এছাড়া গণ-অভ্যুত্থানে শহীদের পরিবার ও আহতদের ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা পর্যাপ্ত না হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। যথাযথ ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসনের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন এবং সংঘর্ষ হয়েছে। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের কার্যালয় ভাংচুরও করা হয়েছে। অনুদান প্রদানের কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিরও অভিযোগ উঠেছে। আহতদের মধ্যে যাদের ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সাথে সখ্যতা আছে, তারা আগে টাকা পাচ্ছেন এমন অভিযোগ রয়েছে। হতাহতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মনোযোগের ঘাটতি দেখা যায়।

সম্প্রতি ৮ মে জুলাই ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পদ থেকে মীর মাহবুবুর রহমান (স্নিগ্ধ) পদত্যাগ করায় নতুন সিইও হিসেবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কামাল আকবর যোগদান করেন। নতুন সিইও ও কোষাধ্যক্ষ কেউ শহীদ পরিবারের না হওয়ায় শহীদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে ক্ষোভ দেখা যায় এবং তাদের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। এছাড়া শহীদ পরিবারের স্থায়ী আবাসনে বিনামূল্যে রাজধানীর মিরপুরে ৮০৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগ থাকলেও বিভিন্ন খাতে অস্বাভাবিক ব্যয় ধরার কারণে প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন পায়নি। ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্যোগে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। "জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর" নির্মাণে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণে ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা এড়িয়ে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতিতে কাজ দেওয়া রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৫. নির্বাচন

অগ্রগতি: বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান আইন অনুসরণ করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশনের গৃহীত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন দেওয়া, রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকে বৈধ ঘোষণা, আইন সংশোধন করে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং পরবর্তীতে নিবন্ধন স্থগিত করা। বর্তমানে নিবন্ধিত দল ৫০টি। নতুন কিছু রাজনৈতিক দলের (গণ অধিকার পরিষদ, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, এবি পার্টি, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি) নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধন পেতে নির্বাচন কমিশনে ১৪৪টি রাজনৈতিক দলের আবেদন করেছিল। এছাড়া জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের চাপে পড়ে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা সরকারের দুর্বলতার পরিচায়ক।

নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে 'জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫'-এর খসড়ায় নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধির খসড়া সংশোধনী প্রণয়ন ও অংশীজনদের মতামতের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘাটতি: বিচার, সংস্কার, নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকার কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে কোনো কোনো দলের সমালোচনা দেখা যায়। এছাড়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল ('কিংস পার্টি') গঠনের অভিযোগ রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে বক্তব্য দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিএনপি'র চাপের মুখে ও লন্ডনে প্রধান উপদেষ্টার সাথে বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাক্ষাতের পর সব প্রস্তুতি সাপেক্ষে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের ঘোষণা করা হয়। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নিয়ে বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি করা হয়েছে। এছাড়া বিএনপি'র সাথে আলোচনা করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মনোমালিন্য দেখা দেয় - ঐকমত্য কমিশনের আলোচনা বর্জনের মতো ঘটনাও ঘটেছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

৬. রাষ্ট্রীয়/ সরকারি কার্যক্রম

ক. আইন-শৃঙ্খলা

অগ্রগতি: পুলিশকে সক্রিয় করা ও দলীয়করণমুক্তির প্রচেষ্টা হিসেবে পুলিশে ব্যাপক রদবদল করা হয়। এ সময়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে। কোনো কোনো 'মব' ও ঘটনার পর গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা আগস্ট ২০২৪ থেকে দুই মাস করে বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০২৫ এর ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' পরিচালনা করা হয়। ২১ দিনে সারাদেশে ১২ হাজার ৫০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে দেখা যায়, পুলিশ বাহিনীতে মৌলিক সংস্কারের পরিবর্তে কেবল অব্যাহতি, পদোন্নতি, পদায়ন ও বদলির দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

ঘাটতি: ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নেতিবাচক ভূমিকার কারণে পুলিশের ভাবমূর্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের আগে-পরে সারা দেশে বিভিন্ন থানায় হামলা হয়, বিভিন্ন স্থানে সহিংসতায় ৪৪ জন পুলিশ সদস্য নিহত হন। সরকার-পতনের অব্যবহিত পরের কয়েকদিন সারা দেশে পুলিশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ছিল, যে কারণে অনেক থানার অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট হয়েছে। পুলিশি কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতি লক্ষ করা গেছে। আন্দোলনে সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আন্দোলনের পর পর পুলিশের অনুপস্থিতি, এবং পরবর্তীতে নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহের কারণে সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। পুলিশের নির্লিপ্ততা ও দায়িত্ব পালনে অনাগ্রহ পেশাদারিত্বের ঘাটতি নির্দেশ করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এখনো অব্যাহত - খুন, ডাকাতি, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, আন্দোলন, লুটপাট, অরাজকতা একই রকম বা বেশি হয়েছে। ঢালাওভাবে মামলায় আসামী হিসেবে নাম দেওয়া, গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগ, রাজনৈতিক চাপ বাড়লে গ্রেপ্তার বৃদ্ধির অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যা ও আইন-শৃংঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুও অব্যাহত রয়েছে। এ সময়ে আইন হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ('মব জাস্টিস') বৃদ্ধি পেয়েছে; গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনার আশংকাজনক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের মবকে ক্ষুব্ধ মানুষের 'প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে অভিহিত করছে, যা মবকে উৎসাহিত করে। ছাত্র-জনতা ও দলীয় 'মব' তৈরির মাধ্যমে দাবি আদায়ের প্রবণতা লক্ষ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাবি আদায়ে সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশের কার্যক্রমে বৈষম্য দেখা যায় - কোনো পক্ষের প্রতি নমনীয় মনোভাব আবার কোনো পক্ষের ওপর নির্যাতন করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এছাড়া সামাজিক অসহনশীলতা রোধে সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

খ. বিচারিক সেবা

অগ্রগতি: সহজভাবে জনগণকে সেবা দেওয়া এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে কর্মরত সহকারী রেজিস্ট্রার হতে তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ১৮ সেপ্টেম্বর ১২ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়। হাইকোর্টের মামলার তদন্তে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন এবং তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে জেলা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয় - ২১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মোট ১৫ হাজার ৬০০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

ঘাটতি: সাবেক সরকারের সময়ে দায়ের করা মামলা ও রায় থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যেমন মানহানির মামলা থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মহাসচিব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, স্থায়ী কমিটির সদস্যদের খালাস দেওয়া হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, নাশকতার মামলা থেকে খালাস, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দণ্ড মওকুফ করা হয়েছে এবং তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। একদিকে পুরনো মামলা নিষ্পন্নে ব্যর্থতা, অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি করে বিচার সম্পন্ন করা হয়েছে। মামলা নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া আদালত প্রাঙ্গনে বিচারক, আইনজীবী, বাদি-বিবাদীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। বিভিন্ন সময় তাদের ওপর হামলা হয় এবং আদালত প্রাঙ্গনে বিশৃংখলা তৈরি হয়।

গ. আর্থিক খাত

অগ্রগতি: আর্থিক খাত সংস্কারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটি ও টাস্কফোর্স গঠন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে - দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরতে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছে এবং বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ খাতে গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক খাত সংস্কার, প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা, শেয়ারবাজার সংস্কার, অর্থপাচার রোধ, ডলারের হার নিয়ন্ত্রণ এবং কর ফাঁকি খতিয়ে দেখে রাজস্ব উদ্ধারের ব্যবস্থা। মূল্যস্ফীতি আগস্ট ২০২৪-এ ১০.৪৯% থেকে কমে জুন ২০২৫-এ ৮.৪%-এ নামলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্বস্তি আসেনি - খাদ্য মূল্যস্ফীতির চাপ, কর্মসংস্থান আশানুরূপ হারে না বাড়া এবং দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে ৩০ বিলিয়ন ডলার, যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পদ্ধতিতে ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ২৪.৯৯ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাসী আয় ছিল ৩০.৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২৬.৮৩% বেশি। রিজার্ভ ব্যবস্থাপনায় স্বস্তির ইঙ্গিত থাকলেও কাঠামোগত চাপ এবং প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ সীমিতই রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্কের হার শেষ পর্যন্ত ২০ শতাংশে নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আপাতত সমূহ বিপর্যয় এড়ানো গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ২০২৫ সালের এপ্রিলে বিনিয়োগ সম্মেলনের আয়োজন করে এবং সম্মেলনে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে দেশে মোট ১৫৮ কোটি ডলারের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) আসে বলে জানা যায়। তবে এ সম্মেলনের ফলাফল নিয়ে সমালোচনা রয়েছে, কারণ বিদেশি অর্থায়নের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এর ব্যবহারে দক্ষতা ও সুশাসনের ঘাটতির কারণে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ অনেকটা স্থবির অবস্থায় রয়েছে এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত এবং অর্থনৈতিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ঘাটতি: সঠিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করা হলেও খাতভিত্তিক বরাদ্দে গতানুগতিক ধারা অব্যাহত ছিল। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সামগ্রিক বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প বাদ পড়েছে। বাজেটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও মানব উন্নয়নের অগ্রাধিকার যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। শ্বেতপত্র ও টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনের সুপারিশ গুরুত্ব না দেওয়া এবং বাজেটে তার প্রতিফলন না থাকার অভিযোগ রয়েছে। সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ আমলে নেওয়া হলেও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে নীতিনির্ধারণে সরকারের নিজস্ব প্রতিবেদনের সুপারিশ কেন উপেক্ষা করা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠনের কথা বলা হলেও এখনো কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে দেশের মোট বিতরণকৃত ঋণের ২৪.১৩ শতাংশ, অর্থাৎ ৪ লাখ ২০ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪.৬৩ লাখ কোটি টাকার সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায় হয়েছে মাত্র ৩.৭০ লাখ কোটি টাকা, যার ফলে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯৪ হাজার কোটি টাকা। কোনো মাসেই রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি; আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও আয়করের কোনো খাতেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। তৈরি পোশাকশিল্পে ১৮ দফা বাস্তবায়নে মালিকপক্ষ সম্মত হলেও প্রকৃত অর্থে তা বাস্তবায়নে মালিকদের একটি অংশ ব্যর্থ হয়েছে; শ্রমিকদের বেতন-বোনাস না দেওয়া, বায়োমেট্রিক ব্ল্যাকলিস্টিং এবং তৈরি পোশাকশিল্পে বিশৃঙ্খলার কারণে দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৫০টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (এডিপি) বাস্তবায়ন গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিল (বাস্তবায়নের হার ৬৭.৮৫%)। শেয়ারবাজার এখনো অস্থিতিশীল - দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শেয়ারবাজারে অস্থিরতা ও জবাবদিহির ঘাটতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধারে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এনবিআর বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুটি আলাদা বিভাগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এই সিদ্ধান্তে সরকারের স্বচ্ছতা এবং অংশীজনের অংশগ্রহণের ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। রাজস্ব কর্মীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আইন সংশোধনের ঘোষণা দেওয়া হলেও আন্দোলনে যুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধান, বাধ্যতামূলক অবসর ও সাময়িক বরখাস্তের ঘটনা ঘটেছে। এনবিআর কর্মকর্তাদের আন্দোলন ও কর্মবিরতির প্রেক্ষাপটে সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক আরোপের প্রেক্ষিতে সরকারের গৃহীত উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত না করা এবং 'নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষরের বিষয়গুলো নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে সরকারের পক্ষ থেকে অংশীজনকে সম্পৃক্ততা করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘ. শিক্ষা

অগ্রগতি: ১৮ মে ২০২৫ দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নে সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালন করবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি, গণরুম প্রথা বাতিল করা হয়েছে, এবং নিয়মতান্ত্রিক আসন বরাদ্দ করা শুরু হয়েছে। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ঘোষণা দিলেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি চলমান। শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতার পেছনে ছাত্ররাজনীতির প্রভাব রয়েছে যা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের উদ্দেশ্য ব্যাহত এবং আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষিত করেছে। এছাড়া বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে এক বা একাধিকবার পদায়ন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও রদবদল হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও রদবদলে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ও প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন অ্যাডহক বা অস্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি কলেজে অ্যাডহক কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে- ডিগ্রি প্রোগ্রামে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের পেশাগত ই-লার্নিং উন্নয়নের জন্য একটি মডুলার-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি। ২ হাজার ৩৮২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকদের বেতন গ্রেড একধাপ উন্নীত এবং বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের 'বিশেষ সুবিধা' বিশেষ করে বেতন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঘাটতি: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর সরকারি ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেন। উপাচার্য পদত্যাগ বা অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে। তবে উপাচার্য নিয়োগের মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে উপাচার্য নিয়োগে দলীয় মতাদর্শের আনুগত্যের ধারা থেকে বের হতে পারেনি। শিক্ষার্থী ও 'জনতা'র চাপে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের লেখা ও আদিবাসী সংশ্লিষ্ট গ্রাফিতির চিত্র পরিবর্তন করা হয়। এছাড়া বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার, যা সরকারের নতজানু নীতির বহিঃপ্রকাশ বলে সমালোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন

মহল থেকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাবি করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাকরিচ্যুতি ও শিক্ষাদানে বিরত রাখার উদাহরণ দেখা যায় এবং শিক্ষক পদায়ন ও বদলি করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক আন্দোলন ছিল পুরো সময়জুড়ে। যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সব আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং সংকটগুলো চিহ্নিত করে সুচিন্তিত সমাধানে উদ্যোগের ঘাটতি দেখা যায়। এ বছর বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণে দীর্ঘসূত্রতা হয়েছে। ২০২৫ সালে বই বিতরণ শেষ হয় মার্চ মাসে, যদিও অনলাইনে বই ছিল, কিন্তু সকলের কাছে ইন্টারনেট না থাকায় এবং তা সহজে শিক্ষার্থীদের কাছে পঠনযোগ্য না হওয়ায় মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম কিছুটা স্থবির হয়। অন্তর্বর্তী সরকার শিক্ষার সংকট নিরসনে সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা করে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করলেও তা ধীরগতিতে চলছে।

ঙ. স্বাস্থ্য

অগ্রগতি: এ খাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাত হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়া ও ট্রেইনি চিকিৎসকদের ভাতা ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওষুধ সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশে 'ফার্মেসি নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সারাদেশে সরকারি ৭০০ হাসপাতালে এই ফার্মেসি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ঘাটতি: বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক রদবদল হয়েছে। একটি চিকিৎসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য প্রশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাতিল, বদলি ও পদায়নে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়। চিকিৎসা সম্পূর্ণ না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হতাহতদের বিরুদ্ধে সুস্থ হওয়ার পরেও শয্যা দখল করে রাখার অভিযোগ রয়েছে। দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির কারণে এ খাতে বিশৃঙ্খলা চলমান।

চ. স্থানীয় সরকারব্যবস্থা

অগ্রগতি: ৫ আগস্ট ২০২৪ এর পর সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণ করা হয়। সব মিলিয়ে ১২টি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ৬০টি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সারা দেশের সব (৪৯৩) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, নারী ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদের অর্থাৎ স্থানীয় সরকারের এই চার স্তরে সব মিলিয়ে ১,৮৭৬ জন জনপ্রতিনিধিকে অপসারণ করা হয়েছে। তাদের জায়গায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানে বিশৃঙ্খলা ও দীর্ঘসূত্রতা হয়।

ঘাটতি: কর্তৃত্ববাদী সরকার পতন-পরবর্তী সময়ে সারা দেশে ১ হাজার ৪১৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান কার্যালয়ে অনুপস্থিত ছিল। জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় সরকারপ্রতিষ্ঠানের কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ সময় বিভিন্ন ভাতার তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের পুনরায় যোগ্যতা যাচাই করা হয়। জনপ্রতিনিধি না থাকায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত ভাতাভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে অসুবিধা হয়েছে এবং পুরোপুরি ঠিক করতে না পারায় নতুন তালিকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে সুবিধাভোগীদের দুর্ভোগ ও ভাতা পেতে বিলম্ব হয়।

আদালতের রায়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্ধারিত হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতায় আন্দোলন হয়। নির্বাচিত মেয়র ও সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টার পাল্টাপাল্টি অবস্থানের ফলে ৪৩ দিন অচলাবস্থা বিরাজ করে বিধায় বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নিয়োগে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায় এবং আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়।

ছ. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

অগ্রগতি: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে চুক্তি বিলম্ব ও পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার আওতায় আদানি পাওয়ারের সাথে একচেটিয়া চুক্তির শর্ত পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং পায়রা বন্দরে মার্কিন কোম্পানি এক্সিলারেটরের সঙ্গে ভাসমান টার্মিনালের টার্মশিট বাতিল করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি আইন, ২০১০ রহিত করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ-জ্বালানির চুক্তি পর্যালোচনার জন্য জাতীয় কমিটি গঠিত হয়েছে; একইসঙ্গে দায়মুক্তি এবং মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেওয়া-সংক্রান্ত বিধান নিয়ে আদালতের রুল জারি করা হয়েছে। নতুন করে কুইক রেন্টাল চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিগত সরকারের আমলে করা চুক্তিগুলো পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বিদ্যুৎ খাতে চুক্তি সংশ্লিষ্ট আইনের কারণে কিছু ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল বা পুনঃচুক্তি করতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। ফলে ব্যয়বহুল চুক্তিগুলো চালু থাকায় বাজেট ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের প্রভাব রয়ে গেছে। নির্বাহী আদেশে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ বিশেষ করে গ্যাস ও বিদ্যুতের ট্যারিফ নির্ধারণে জনশুনানির কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বকেয়া হ্রাস ও ঋণ পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে আদানি পাওয়ারকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বকেয়া পরিশোধে ঋণ প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে অগ্রাধিকার পুনর্মূল্যায়ন করে পতিত সরকারের সময়ে অনুমোদিত কমপক্ষে ৩১টি প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সৌর বিদ্যুৎ চালু এবং সরকারি ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই খাতে কাঠামোগত সংস্কারের অংশ হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অধীন Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA)-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঘাটতি: আদানি ও ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি প্রকাশ করা হয়নি, পাশাপাশি চুক্তি মূল্যায়নের প্রতিবেদনও জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। এতে চুক্তি প্রকাশ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জ. পরিবেশ সংরক্ষণ

অগ্রগতি: পরিবেশবান্ধব পর্যটনের অংশ হিসেবে সেন্ট মার্টিন ও টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, যার ফলে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও বিকল্প জীবিকার পরিকল্পনা না করে পর্যটক নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্বীপবাসী আর্থিক দুর্দশায় পড়েছেন। বনভূমি সংরক্ষণের অংশ হিসেবে কক্সবাজারে ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংসের কার্যক্রম বন্ধ, 'রক্ষিত' বনভূমির বরাদ্দ ও সংরক্ষিত বনে সাফারি পার্ক প্রকল্প বাতিল এবং সুন্দরবনের পাশে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে; ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এক হাজার ৭১৭ একর বনের জমি উদ্ধার ও নতুন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে, যদিও বনাঞ্চল ধ্বংস প্রতিরোধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে পাখি আমদানি, বন্যহাতি সুরক্ষা ও চুরি যাওয়া বন্যপ্রাণী উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বায়ুদূষণ প্রতিরোধে ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধের অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৭৯৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও অন্যান্য দূষণকারী উৎসে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং খাল ও নদী উদ্ধার, পাথর কোয়ারি ইজারা বন্ধ ও মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

ঘাটতি: ২০২৪ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বায়ুদূষিত দেশ এবং ঢাকা তৃতীয় দূষিত নগরী হিসেবে চিহ্নিত হয়, যেখানে পিএম ২.৫ এর মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ডের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি ছিল। পাথর কোয়ারি বন্ধে ও বনাঞ্চল উজাড় রোধে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে স্থানীয় সুবিধাভোগী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরোধিতা লক্ষ করা যায়।

ঝ. বৈদেশিক কর্মসংস্থান

অগ্রগতি: দুবাই থেকে আটকৃতদের ক্ষমা ও ফেরত আনা হয়েছে। প্রবাসীদের বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি এবং অভিবাসন প্রক্রিয়া সহজতর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জনবল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য বিমানবন্দরে ভিআইপি সার্ভিস প্রদানের সিদ্ধান্ত হলেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অভিবাসী কর্মীরা এই সুবিধা ব্যবহারে নিরুৎসাহিত। মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে এবং প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে।

ঘাটতি: গণ-অভ্যুত্থানের পরেও প্রবাসীরা উপেক্ষিত রয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রবাসী আয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বৈদেশিক কর্মসংস্থানে অবনতি দেখা গেছে। বিকল্প শ্রমবাজার অনুসন্ধানে পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির সিন্ডিকেট ভাঙার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঞ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

অগ্রগতি: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছে বা সহায়তার অঙ্গীকার করেছে। দুর্নীতি দমনে সহায়তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে-পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার, এবং দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তে আন্তর্জাতিক সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পক্ষ থেকে মানবাধিকারের সুরক্ষা, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, সহিংসতার ঘটনার পূর্ণ এবং স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজনীয়তা, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা, এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঢাকায় তিন বছরের জন্য জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারের কার্যালয় স্থাপনে সমঝোতা করা হয়েছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলেও প্রকৃত কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।

ঘাটতি: রাখাইনে 'মানবিক করিডর' প্রদানে নীতিগত সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও সরকারের অবস্থান অস্পষ্ট এবং তথ্য প্রকাশে ঘাটতি রয়েছে। তথ্য প্রকাশে সমন্বয়হীনতা ও গোপনীয়তার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অবন্ধুসুলভ অবস্থায় রয়েছে - ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, সীমান্তে হত্যা ও 'পুশ ইন' অব্যাহত রেখেছে, বাণিজ্যে

বাধা আরোপ করেছে, কূটনৈতিক টানাপোড়েন অব্যাহত রয়েছে এবং শেখ হাসিনার প্রত্যার্পণ ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। ভারতের অবন্ধুসুলভ আচরণের ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সংকট ও তার ফলে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব অব্যাহত রয়েছে।

৭. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থপাচাররোধ

ক. অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ

অগ্রগতি: দুর্নীতি দমন কমিশনের আগের তুলনায় সক্রিয়তা দৃশ্যমান। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দুদক সাবেক প্রধানমন্ত্রী, প্রভাবশালী সাবেক মন্ত্রী, এমপি, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমলা, পুলিশ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা করেছে। পাশাপাশি দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, ব্যাংক হিসাব ও অর্থ-সম্পদ জব্দের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুদক মোট ৭৬৮টি অনুসন্ধান ও ৩৯৯টি মামলা দায়ের করেছে, যার মধ্যে ৩২১টি মামলায় (৮০ শতাংশের বেশি) অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত দায়েরকৃত ১৫৩টি মামলায় ৪৭৭ জন আসামির মধ্যে সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ (১৪৪ জন)। দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ সত্ত্বেও দুর্নীতির পরিস্থিতির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ফ্ল্যাট ও জমি কেনার ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে অবৈধ আয় বা কালো টাকা বৈধ করার সুযোগ বহাল রাখা হলেও ব্যাপক সমালোচনার মুখে সেই সুযোগ বাতিল করা হয়েছে। দেশের সব সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হলেও দাখিলকৃত বিবরণী পর্যালোচনা করার উদ্যোগ না থাকার ফলে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ঘাটতি: দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। "হাই-প্রোফাইল" ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান হলেও এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান গ্রেপ্তার বা বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়নি। বিগত প্রায় ১৫ বছরে বিএনপি নেতাসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রায় ৫০টির বেশি মামলা দুদক প্রত্যাহার করেছে বা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ টেলিকমের অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক এমপি ও সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রধান সম্পাদক ও বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলা। দুদকের দায়ের করা নাইকো দুর্নীতি মামলায় বিশেষ আদালতের রায়ে খালেদা জিয়াসহ সকল আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। দুদকের কার্যক্রম রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে না পারায় তদন্ত ও মামলা দায়ের এবং মামলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ অব্যাহত রয়েছে। দুদক সংস্কার বিষয়ে প্রায় সার্বজনীন ঐকমত্য থাকলেও অগ্রগতির সম্ভাবনা হতাশাজনক, বিশেষ করে "আশু করণীয়" প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার ও দুদকের ব্যর্থতা লক্ষ করা যায়।

খ. অর্থপাচার রোধ

অগ্রগতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে নয়টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা নিয়ে আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয়েছে। বিদেশি রাষ্ট্র বা সংস্থার মাধ্যমে অর্থপাচার প্রতিরোধে সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেছে এবং কয়েকটি দেশের সঙ্গে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স (এমএলএ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যে সম্পদ ফ্রীজিং ও আইনগত সহায়তায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), স্পটলাইট অন করাপশন এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্যের আহ্বানে যুক্তরাজ্য সরকার ইতোমধ্যে ১৮৫ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পদ জব্দ করেছে। তবে পাচারকৃত সম্পদ ফেরত আনা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া হওয়ায় এখন পর্যন্ত অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়।

ঘাটতি: অর্থ পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত সুবিধাভোগী মালিকানার স্বচ্ছতা (Beneficial Ownership Transparency Act) বিষয়ে করা আইন প্রস্তাব হলেও তা উপেক্ষিত হয়েছে। দেশ থেকে অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং পাচারকৃত অর্থ আপোষ-রফার মাধ্যমে ফেরত আনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে পাচারকৃত অর্থ আপোষ-রফার মাধ্যমে ফেরত আনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে অর্থ পাচার উৎসাহিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৮. অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা

ক. রাজনৈতিক দল

সংস্কার: জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নারী সংস্কার কমিশন বাতিল ও কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের হুমকি প্রদান করেছে। হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশে নারী কমিশন সম্পর্কে অবমাননাকর ও অশ্লীল মন্তব্য করা হয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপের সংলাপের প্রথম পর্বে ৩৩টি ও দ্বিতীয় পর্বে ৩০টি দলের অংশগ্রহণ দেখা গেলেও কিছু দলের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। সংস্কার প্রতিবেদনসমূহের সুপারিশ, বিশেষ করে মৌলিক সংস্কার বিষয়ে কয়েকটি দলের অনড় অবস্থান; ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি নিয়ে কিছু দল হতাশা প্রকাশ করে পারস্পরিক দোষারোপ করেছে। ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ দেশের সর্বস্তরের জনগণের আকাঙ্ক্ষার যথাযথ প্রতিফলন নয় বলে এনসিপি অভিযোগ করেছে। সংলাপে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপে প্রায়শই নিজ দলের স্বার্থ বিবেচনায় অনড় অবস্থান নিয়েছে।

কয়েকটি দল 'ঐক্যের মাপকাঠি' নির্ধারণের তাগিদ দিয়েছে। তবে সংস্কার নিয়ে নানা প্রস্তাব থাকলেও দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র, শুদ্ধাচার চর্চা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক উদ্যোগের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

নির্বাচন: নির্বাচনের তারিখ, সংস্কার ও অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ নিয়ে সরকার ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিতর্কসহনশীলতার ঘাটতি লক্ষণীয়। ফলে সংস্কার ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। নির্বাচন-সংস্কার-মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রমকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর প্রবণতা দেখা গেছে, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর অনড় অবস্থান সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে।

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী আন্দোলনের ভেতরেও বিভাজন দেখা গেছে; রাজনৈতিক মতাদর্শিক লড়াই ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্র হয়েছে। একাংশ 'জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক দল গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসেবে সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত ও জনগণের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকশিত হওয়ার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। অর্থের উৎসের অস্বচ্ছতা, দলবাজি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি এবং অনিয়মের বিদ্যমান সংস্কৃতি ধারণ করে দলটি আত্মঘাতী পথে ধাবিত হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটছে। পুরাতন জোট ভেঙে নতুন রাজনৈতিক জোট বা বলয় তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে একাধিক নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। তবে নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক বাছাইয়ে কোনো দলই শর্ত পূরণ করতে পারেনি। আবেদন করা দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল নামসর্বস্ব, আর এনসিপি নিবন্ধনের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

রাষ্ট্র/ সরকার পরিচালনা: সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া বা মানদণ্ড অনুসরণ না করে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারে থাকা দুই ছাত্র উপদেষ্টার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিএনপি প্রশ্ন তুলে তাঁদের পদত্যাগ দাবি করে। অপরদিকে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে সরকারের তিন উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবি করে এনসিপি। কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলের মতো প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণের চর্চা অব্যাহত রয়েছে, ফলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পুলিশ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন স্পষ্ট। কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের সম্পৃক্ততায় মাজার ভাঙা, নারীদের হেনস্তা, মেলা-ওরস-গান-নাটকের অনুষ্ঠান বন্ধ করা, পাঠাগারে হামলা এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করা হয়েছে এবং সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতা, সমালোচনা ও কর্মসূচি ঘোষণা দেখা গেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের কাজের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, বিশেষ করে বন্দর ব্যবস্থাপনা ও মানবিক করিডোর ইস্যুতে। দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অভিযোগ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দল ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। আগস্ট ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৪৭১টি রাজনৈতিক সংঘাতে ১২১ জন নিহত এবং পাঁচ হাজার ১৮৯ জন আহত আহত হয়েছে - এসব সংঘাতে বিএনপি ৯২%, আওয়ামী লীগ ২২%, জামায়াতে ইসলামী ৫% ও এনসিপি ১% ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ছিল। কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টিতে মদদ দেওয়া হয়েছে, যেখানে সরকারের শক্ত অবস্থান গ্রহণে ঘাটতি ছিল। কিছু রাজনৈতিক দলের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সরকার পতনের পর আওয়ামী লীগের দখলে থাকা প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম পুনর্দখলের চেষ্টা ও সংঘাত হয়েছে - যেমন ঢাকা শহরের ৫৩টি পরিবহন টার্মিনাল ও স্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন চাঁদাবাজি, সিলেটের কোয়ারি ও নদ-নদী থেকে পাথর লুট, এবং সেতু, বাজার, ঘাট, বালু মহাল ও জল মহালের ইজারা নিয়ন্ত্রণ। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়েছে (কর্তৃত্ববাদী সরকারের দোসর হিসেবে বা অভ্যুত্থানে হত্যার অভিযোগ এনে)। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা দেখা গেছে - 'মব' তৈরি, সড়ক অবরোধ, থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ ইত্যাদি। আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, দখলবাজি ও চাঁদাবাজির সংস্কৃতি অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না থাকায় কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং সরকারের পক্ষ থেকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন দলের কর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থে একাত্মতা গড়ে উঠেছে।

খ. নাগরিক সমাজ

সুশাসন ও রাষ্ট্র সংস্কারের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে নাগরিক সমাজ, যার মধ্যে রয়েছে রাজনীতি, সংবিধান, নির্বাচন, অর্থনীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের খসড়ায় মতামত প্রদান এবং বিভিন্ন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব। দলবাজি, দখল, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। মানবাধিকারের পক্ষে ও রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের পাশাপাশি সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনায় প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তথ্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা, গুজব ও অপতথ্য ছড়ানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নির্বাচন, সরকারের

গ্রহণযোগ্যতা ও গৃহীত উদ্যোগের মূল্যায়ন নিয়ে জরিপ প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় জাতিসংঘ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে নাগরিক সংলাপ, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, ট্রানজিশনাল জাস্টিস, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা, রিপোর্টিং ও নেটওয়ার্কিংয়ে সম্পৃক্ততা দেখা গেছে। শিক্ষা কারিকুলাম কমিটি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বাক ও চিন্তার স্বাধীনতাকে পুঁজি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢালাওভাবে অপতথ্য, হেট-স্পিচ, গুজব ছড়ানো এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ভীতি ও দুশ্চিন্তার বিস্তার ঘটছে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কোনো কোনো গণমাধ্যমকে হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং মাঠপর্যায়ে সংগঠনের কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপেক্ষার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

গ. গণমাধ্যম

২০২৫ সালে রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) প্রকাশিত প্রেস ফ্রিডম সূচকে বাংলাদেশ ১৬ ধাপ উন্নতি করলেও দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের অবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়ে গেছে। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন হলেও জাতিসংঘের কিছু সুপারিশ উপেক্ষিত হয়েছে। কিছু সংজ্ঞা এখনো অস্পষ্ট রয়ে যাওয়ায় মতপ্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কিছু ধারা আইনের অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করেছে। এতে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ও নজরদারিমূলক কাঠামো গঠনের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ১২টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে উপদেষ্টা পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না হওয়ায় সরকারি দপ্তরগুলোতে তথ্য গোপনের প্রবণতা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার সংস্কৃতি অব্যাহত রয়েছে। একইসাথে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিপক্ষ দল ও সরকারের বিরুদ্ধে গুজব এবং মিথ্যা তথ্য প্রচারের প্রবণতা দেখা যায়। গণমাধ্যমের ফটোকার্ড ও লোগো ব্যবহার করে অপতথ্য ছড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। এ ছাড়া নেতিবাচক প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনা অব্যাহত ছিল। আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে ৪৯৬ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার হন, যার মধ্যে ২৬৬ জনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট হত্যা মামলার আসামি করা হয়। একই সময়ে তিনজন সাংবাদিক দায়িত্ব পালনকালে হামলায় নিহত হন। আটটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ১১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধান বরখাস্ত হন এবং অন্তত ১৫০ জন সাংবাদিক চাকরি চাকরিচ্যুত হন। গণমাধ্যম কার্যালয়গুলোতে মব তৈরি করে আতঙ্ক সৃষ্টির ঘটনাও ঘটেছে।

প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নিয়ে সরকারের বিতর্কিত কার্যক্রম দেখা যায়। তিন দফায় ১৬৭ জন সাংবাদিকের কার্ড বাতিল করা হয় এবং সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর সাংবাদিকদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া ২০২২ সালের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন নীতিমালা সংশোধন করা হয়। সব মিলিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়নি এবং ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও উপায়ে তা খর্ব হয়েছে। তথ্য কমিশন কার্যকর করা ও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

ঘ. সেনাবাহিনী

কর্তৃত্ববাদ পতনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে সেনাবাহিনী ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম ক্ষমতার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ঘোষণা দিয়েছে এবং সেনাবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার কিছু সদস্যের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্ত চলমান রয়েছে। বেসামরিক প্রশাসন, বিশেষ করে পুলিশের নৈতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সত্ত্বেও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে দৃশ্যমান ঘাটতি রয়েছে। গুজবের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ এবং নিয়মিত প্রচারণাও সেনাবাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল। নির্বাচনের সময়সীমার বিষয়ে সেনাপ্রধানের একাধিকবার মতামত প্রকাশ ও বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলাকালীন মতামত প্রকাশ নিয়ে এখতিয়ার সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কর্তৃত্ববাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, চাঁদাবাজি এবং আর্থিক খাতসহ রাষ্ট্রীয় দখলের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর (ডিজিএফআই, এনএসআই) সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জুলাই-আগস্টে সংঘটিত রাজনৈতিক সহিংসতার সময় সেনানিবাসে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

৯. সুশাসনের ঘাটতি

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে গিয়ে সুশাসনের নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি ও ব্যত্যয় ঘটেছে। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

সুশাসনের ঘাটতির ধরন	উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	
আইনের শাসনের ঘাটতি	▪ আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে গ্রেপ্তার ও রিমান্ড ▪ মামলা ও গ্রেপ্তার বাণিজ্য ▪ গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য দায়মুক্তি ▪ মানবাধিকার লঙ্ঘন - গ্রেপ্তারকৃতরা আদালতে আক্রমণের শিকার; আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে লাঞ্ছিত; সাবেক বিচারপতির ওপর আক্রমণ; আসামী পক্ষের আইনজীবীর ওপর হামলা	▪ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি)-এর সাংবিধানিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব খর্ব ▪ পদোন্নতি পাওয়া বা পদবঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণে ব্যর্থতা ▪ বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা
সক্ষমতা ও কার্যকরতার ঘাটতি	▪ পুলিশের বিরুদ্ধে করা কোনো মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া ▪ বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন ▪ বিচারক ও কৌঁসুলিদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি ▪ বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ বা দমনে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর অবস্থান গ্রহণে দ্বিধা ▪ অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রকৃত তালিকা চূড়ান্ত করতে না পারা ▪ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্ষমতার ঘাটতি	▪ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা ▪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা ▪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত না করা ▪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপসারণের ফলে স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদান বিঘ্নিত
স্বচ্ছতার ঘাটতি	▪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অব্যাহতিতে স্বচ্ছতার ঘাটতি - সরকারের উচ্চপর্যায়ের পদ; আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও বিচার বিভাগে বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও কর্মকর্তা; প্রশাসন; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সিইও ও কোষাধ্যক্ষের নিয়োগ ▪ বিভিন্ন জনের গ্রেপ্তার নিয়ে লুকোচুরি ▪ পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ঘাটতি ▪ বিদ্যুৎ খাতের চুক্তি প্রকাশ না করা	▪ রাখাইনে 'মানবিক করিডর' দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান ও তথ্য প্রকাশে ঘাটতি ▪ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না করা ▪ সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য গোপন করার প্রবণতা ▪ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার চর্চা
সমন্বয় ও অংশগ্রহণের ঘাটতি	▪ সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনগুলো প্রতিনিধিত্বশীল না হওয়া ▪ আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত না করা ▪ এনবিআর ভেঙে দুটি নতুন বিভাগ গঠনের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে অংশীজনের অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি	▪ পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে অংশীজনের সম্পৃক্ততায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতার ঘাটতি ▪ ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ইস্যুতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি
সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন	▪ সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স নির্ধারণ ▪ সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নিয়োগকৃতদের প্রত্যাহার	▪ আইন প্রণয়নের পর প্রবল বিরোধিতার মুখে সংশোধন (সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ)
জবাবদিহির ঘাটতি	▪ অভিযুক্তদের দেশত্যাগে সহায়তাকারীদের জবাবদিহির আওতায় না আনা	▪ গুমের আলামত নষ্টের সাথে জড়িতদের জবাবদিহির আওতায় না আনা
রাজনৈতিক প্রভাব	▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতি	▪ দুর্নীতির মামলা থেকে অব্যাহতি, খালাস
ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব	▪ প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব ▪ গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা হ্রাস, কর অব্যাহতি ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন	▪ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ▪ নিজ এলাকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন, নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং

সুশাসনের ঘাটতির ধরন	উল্লেখযোগ্য উদাহরণ	
		স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অভিযোগ
দুর্নীতি	▪ বঞ্চিত হওয়ার নামে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা আদায় ▪ ডিসি পদায়নে দুর্নীতির অভিযোগ ▪ পাসপোর্ট, ভূমি, বিআরটিএ, ওয়াসা, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতি	▪ এনবিআরের কর্মকর্তাদের একাংশের দুর্নীতি ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ▪ দুই উপদেষ্টার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার দুর্নীতি

১০. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় দেখা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের ফলে রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ অভীষ্ট অর্জন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এক বছরে বিচার, সংস্কার, নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা বাস্তবায়নে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তবে সুশাসনের আলোকে উপরোক্ত খাতগুলোতে বেশ কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা একটি সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যাশিত অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচায়ক।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, সংস্কার কমিশনগুলোর আশু করণীয় সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব কোনো অগ্রগতির তথ্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পতিত, কোনো কোনো সুপারিশ 'বেছে নেওয়া'র প্রবণতা (পিক এন্ড চুজ) দৃশ্যমান। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তথা বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচনে সুস্পষ্ট ও সুপরিকল্পিত কৌশল ও রোডম্যাপ প্রণয়ন ও প্রকাশ না করার ফলে বিভিন্ন সময়ে সরকারের ওপর বিভিন্ন অংশীজনের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ্যাড-হক প্রবণতা, প্রশাসন পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ়তা ও কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা/ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিবর্তন করা যার অন্যতম প্রতিফলন। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপসারণের মাধ্যমে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেলেও একইসাথে একদলের স্থলে অপর দলের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত দলীয়করণের ধারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পুলিশ-প্রশাসনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অস্থিরতা, নতুন রাজনৈতিক বলয় তৈরির প্রয়াস এবং ব্যাপক রদ-বদলের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকরতা লক্ষ করা যায়, এসকল ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দৃশ্যমান ছিল। সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ ভেতর থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, ফলে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশিত পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়নি।

নিজস্ব এজেন্ডাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে অভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত থাকা বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যা গণ-অভ্যুত্থান থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে। মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নে সুস্পষ্ট বিভাজন পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি - দলবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্য বিস্তারের সংস্কৃতি চলমান। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও রাষ্ট্র সংস্কারের মূল চেতনা ধারণ ও রাষ্ট্র সংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তথ্য প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও সমালোচনার সুযোগ সার্বিকভাবে মুক্ত পরিবেশ ও বাক-স্বাধীনতার পরিচায়ক বিবেচিত হলেও একদিকে কোনো কোনো মহলের অতিক্ষমতায়ন ও তার অপব্যবহার, এবং চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা অসাম্প্রদায়িক সম-অধিকারভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশের অভীষ্টের পথে অন্তরায়। এক বছরে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ও প্রভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের কারণে জেন্ডার, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে, যা বৈষম্যবিরোধী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক।

সবশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র সংস্কারের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহে বেশিরভাগ বিষয়ে বড় দল ও সহযোগীদের ভিন্নমত "নোট অব ডিসেন্ট"-সাপেক্ষে জুলাই সনদে ঐকমত্য বিবেচিত হওয়ায় কর্তৃত্ববাদী চর্চা বাস্তবে প্রতিহত করা সম্ভব হবে, এমন প্রত্যাশার পথ দুরূহ। অন্যদিকে, ঐকমত্য অর্জিত সংস্কার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সাংবিধানিক ও আইনগত বাধ্যবাধকতা ও সুনির্দিষ্ট পথরেখা কিভাবে নিশ্চিত হবে এই অমীমাংসিত প্রশ্ন থেকে সংস্কারের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া ও রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।